শান্তশ্রী শান্তা

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুণ্যভূমি প্রাচীনকাল হতেই সত্যদর্শী ঋষি ও ঋষিপত্নীগণের কঠিন তপস্যার আধ্যাত্মিক আলোকে সমুজ্জ্বল ছিল। প্রাচীন যুগ হতেই বহু নারী কঠিন তপস্যায় রত থেকে তাঁদের ঋষি-পতিদের সমতুল্য হয়ে উঠেছিলেন। সেইসব ঋষিপত্নীদের মহান জীবনের বিস্তারিত পরিচয় অধিকাংশই পাওয়া যায় না। পুরাকালের মহীয়সী ঋষিপত্নীদের মধ্যে সতী, অনসূয়া, অহল্যা, গৌতমী এঁদের নাম আমাদের জানা থাকলেও এঁরা যে একএকজন অনন্যা তপস্বিনী ছিলেন, সে বিষয় সর্বজনবিদিত নয়। পুরাকালের অধিকাংশ রাজাগণ ধার্মিক ছিলেন এবং পুরাণ কাহিনী পরিক্রমা করলে দেখা যায় যে বহুরাজাই তাঁদের কন্যাকে কোনো মুনি বা ঋষির হস্তে সম্প্রদান করতেন। সেইসব রাজকন্যাদের বিবাহের পরবর্তী অবস্থায় ঋষিগৃহে যে তপস্বিনীর জীবন-যাপন বা সহধর্মিনীরূপে কঠোর তপোব্রত পালন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে এমনই এক পুরাণ প্রসিদ্ধ রাজার কন্যা ছিলেন দেবী 'শান্তা' ।

সূর্যবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা দশরথ ও কৌশল্যার ঔরস জাতা ও দশরথের পরম মিত্র অঙ্গরাজাধিপতি লোমপাদ বা রোমপাদের পালিতা কন্যা ছিলেন দেবী শান্তা। অঙ্গরাজ নিঃসন্তান হওয়ায় এবং কন্যাসন্তান সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী বিবেচিত না হওয়ার দরুণ রাজা দশরথ তাঁর কন্যা শান্তাকে লোমপাদকে প্রদান করেন। শান্তাকে বন্ধুর কাছে দত্তক দেওয়ার আরও একটি কারণ, জন্মের পর ব্যাধির প্রকোপে শান্তার প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হলে বিজ্ঞজনেরা পরামর্শ দেন যে রাজা দশরথ যদি এই সন্তান কে অপর কোন পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করেন, যাঁরা তাঁকে এক দেবশিশু রূপে প্রতিপালন করবেন, তবেই একমাত্র এই সন্তানের জীবন বিপদমুক্ত হতে পারে। আপন সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে রাজা দশরথ তখন তাঁর প্রাণপ্রিয় শান্তাকে তাঁর বিশিষ্ট মিত্র অঙ্গরাজ লোমপাদকে দত্তক প্রদান করেন। লোমপাদ শান্তাকে নিজ কন্যারূপেই প্রতিপালন করতে লাগলেন। রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শান্তা দেবী ক্রমশঃ শান্তশ্রীরূপে বিকশিত হতে লাগলেন।

অঙ্গরাজ্যের সন্নিকটে শান্তার জন্মের কিছু পূর্বে দৈববশতঃ মহাবীর্য্যশালী বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ কৌশিকী নদী তীরস্থ বনাঞ্চলে ঋষ্যাশ্রমে জন্মলাভ করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের মাতা ছিলেন অভিশপ্ত মৃগীরূপী এক দেবকন্যা, যিনি ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে,'' তুমি মৃগী হয়ে কোন ঋষির জন্ম দিলে তোমার মুক্তি হবে।'' একদা বিভাণ্ডক ঋষি হ্রদে স্নান করার সময় অপ্সরা উর্বশীকে দেখে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য হলে তাঁর বীর্য সেই হ্রদের জলে পতিত হলে মৃগীরূপী দেবকন্যা সেই জলপান করে গর্ভিণী হন। সেই কারণে মৃগীরূপী দেবকন্যা পুত্রের জন্ম দিয়েই তার পিতার নিকট পুত্রকে রেখে দিয়ে স্বস্থানে চলে গিয়েছিলেন। শাস্ত্রপাঠ, সাধনা ও তপস্যার মধ্যে দিয়েই তিনি বড় করে তুললেন ঋষ্যশৃঙ্গকে। তখন সেই বনের মধ্যে পিতার সঙ্গে অবস্থান করে তপস্যাকরত ঋষ্যশৃঙ্গ 'মহর্ষি' রূপে অভূতপূর্ব খ্যাতিলাভ করেন। তপোলব্ধ জীবনে ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর পিতা ভিন্ন অপর কোনও মানুষকে কোনদিনও দেখেননি। এজন্য ব্রহ্মচর্য্যে তাঁর মন সদা নিবিষ্ট ছিল। এই সময়ে অঙ্গরাজ্যের রাজা লোমপাদ অধিপতি হয়েছিলেন। ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সজ্ঞানে একজন সৎব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যাচার করলে পরে তখন সকল ব্রাহ্মণগোষ্ঠী দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তার ফলে কোনও পুরোহিত না পাওয়ায় যজ্ঞাদি দৈব কর্ম তাঁর রাজ্যে পণ্ড হয়ে গিয়েছিল এবং ধার্মিক রাজার এরূপ অধার্মিক আচরণের জন্য ইন্দ্রদেবতা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বর্ষণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যার ফলে অঙ্গরাজ্যে ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। অনাবৃষ্টি ও অন্নাভাবে বিপর্য্যস্ত রাজ্যকে রক্ষা করতে রাজা লোমপাদ তখন ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে এর প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। রাজ্যের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের পরামর্শে রাজা মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র মহা তেজস্বী ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়ন পূর্বক মাঙ্গলিক যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য মনস্থ করেন। মহাতেজা ঋষির গুণাবলী সম্বন্ধে রাজা লোমপাদ পূর্বেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন যদি কোনোভাবে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়ন করা সম্ভব হয় তবেই অনাবৃষ্টির সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু মহর্ষি বিভাণ্ডককে অতিক্রমকরত পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ। এই কথা চিন্তনকরত রাজা লোমপাদ তখন প্রথমে তাঁর অনুচর বর্গকে পাঠালেন ঋষির কাছে। কিন্তু তারা বিফল হয়ে ফিরে এলে রাজা তখন তাঁর সৈন্যবর্গকে প্রেরণ করলেন ঋষিকে আনয়ন করতে। তারাও ঋষির পিতার ভয়ে ফিরে এলে তখন খরা পীড়িত রাজ্যের দুর্দশায় ব্যাথিত রাজা লোমপাদ রাজ্যের মন্ত্রী-অমাত্যদিগের সঙ্গে পরামর্শ করে সুকৌশলে যাতে ঋষিকে আনয়ন করতে পারেন তার উপায় নির্ধারণ করলেন। তারপর রাজা রাজ্যের বারাঙ্গণাগণকে আহ্বান করে তাদের সহায়তায় ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনয়ন করবার জন্যে আদেশ দিলেন। কিন্তু মুনির অভিশাপের ভয় কেহই প্রায় রাজী হলনা এ কাজ করতে। তখন একজন বৃদ্ধা বেশ্যা চিন্তাভাবনা করে তার বুদ্ধিমতী কন্যা বারাঙ্গণাকে প্রেরণ করল ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে ছলে-বলে-কৌশলে আনয়ন করার জন্যে। বারাঙ্গণাগণ স্বভাবতঃই প্রলোভনাদি কার্যে কুশল। সেই

বারাঙ্গণা তখন রাজার নিকট হতে উপযুক্ত সম্ভার নিয়ে এক আশ্চর্য্যজনক নাব্যাশ্রম (নৌকায় আশ্রম) নির্মাণ করে নদীপথে পাড়ি দিল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উদ্দেশ্যে। কশ্যপাশ্রমে পৌঁছিয়ে সে তখন নানাভাবে ঋষিকে প্রলোভিত করতে লাগল এবং ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার অনুপস্থিতিতে ছলনাপূর্বক তাঁকে আকৃষ্ট করে নাব্যাশ্রমে আনয়ন করত নদীপথে লোমপাদের রাজ্যে নিয়ে এল। যখন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন তখনি সহসা ইন্দ্রদেব বর্ষণ আরম্ভ করলেন এবং সারারাজ্য বর্ষায় আপ্লুত হয়ে গেল। লোমপাদের কামনা পূর্ণ হল। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে তখন নিজ কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করলেন। তারপর রাজা ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডককেও সন্তুষ্ট করলেন। মহর্ষি বিভাণ্ডক সেই রাজশ্রেষ্ঠ কর্তৃক পূজিত হয়ে নিজপুত্র ও সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা পুত্রবধু শান্তাকেও আশীর্বাদ করলেন। তখন বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে এই কথা বলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করলেন যে, তুমি রাজার সকল কর্ম সম্পাদন করবে এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলে পরে বনে আশ্রমে চলে আসবে।'' পরবর্তীকালে ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার বচনানুসারে লোমপাদের প্রিয় সকল কার্য্য সম্পাদন করে পুনরায় বনে পিতার নিকট তপোলব্ধ জীবনে ফিরে গেলেন। তখন দেবী শান্তাও পতির অনুগামিনী হলেন। সৌভাগ্যশালিনী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, দময়ন্তী যেমন নলের, শান্তাও সেইরূপ ঋষ্যশৃঙ্গের অনুকূলা হলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ এবং শান্তাদেবীর তপোপ্রভাবে সেই স্থল তখন পবিত্রতীর্থে পরিণত হল। কথিত আছে উত্তরাঞ্চলের শিব-তীর্থে শান্তা 'শৃঙ্গী' মুনিকে পতিরূপে লাভকরার জন্যে একসময় কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই 'শৃঙ্গী' মুনিই হলেন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ।

ইত্যবসরে রাজা দশরথ পুত্র কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করায় তাঁর মন্ত্রী সুমন্ত্র তখন রাজা দশরথকে বলেন যে পুরাণে কথিত আছে সত্যযুগের আদিতে ব্রহ্মার মানস পুত্র ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণের সমক্ষে পূর্বেই ভগবান শ্রীরামের অদ্ভুত অলৌকিক জন্মকথা বিষদভাবে বলেছিলেন। ভগবান সনৎকুমারের সেই হিতকর ভবিষ্যৎবাক্য তখন মহামন্ত্রী সুমন্ত্র রাজা দশরথকে বলেন। ভগবান সনৎকুমার বলেছিলেন যে দশরথ তাঁর পরম বন্ধু লোমপাদের কাছে গিয়ে তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবার জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞের ফলস্বরূপ রাজা দশরথের অতুল বলসম্পন্ন চারি পুত্র জন্মলাভ করবেন। এই কথা শুনে রাজা দশরথ ঋষি বশিষ্ঠের অনুমতিপূর্বক অঙ্গরাজ্যে রাজা লোমপাদের কাছে গমন করলেন ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের উদ্দেশ্যে। বাল্মিকী রামায়ণে আছে, রাজা দশরথ অঙ্গরাজকে বলেছিলেন, ''হে রাজন! আমি পুত্রহীন, তাই আমি একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক। আপনি দয়াপূর্বক আপনার কন্যা শান্তার পতি ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আমার বংশরক্ষার্থে পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের ঋত্বিক পদে নিযুক্ত হইবার জন্যে অনুমতি প্রদান করুন।'' দশরথের কথা শুনে লোমপাদ তখন ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার গুরুত্ব কতখানি তা বোঝালেন। তখন ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথের যজ্ঞানুষ্ঠানে ঋত্বিক হতে রাজী হন এই শর্তে যে তাঁর সহধর্মিনী দেবী শান্তাও সেই অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে সেই যজ্ঞে ঋত্বিক থাকবেন। অতঃপর মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নী শান্তাদেবীসহ অযোধ্যায় প্রবেশ করলে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে নগরী। শঙ্খনাদে তাঁদের স্বাগত জানায় নগরবাসীগণ । শান্তার মনেও আনন্দ আর ধরে না! পিতা দশরথ আর মাতা কৌশল্যার ওপর কোনও অভিমান নেই তার অন্তরে। তাঁর পিতা যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁর স্বামীকে পুরোধা নিযুক্ত করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তারজন্যে শান্তা নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করছেন। সুন্দরী শান্তাই যে মহাতেজস্বী ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী ও দশরথেরই কন্যা, তা অবলোকন করে দশরথ ও কৌশল্যা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষিগণের উপস্থিতিতে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তাদেবী আরম্ভ করলেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। সেই যজ্ঞাগ্নি হতে অগ্নিদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে অমৃতস্বরূপ পরমান্ন প্রদান করলেন এবং সেই পরমান্ন ভক্ষণ করেই দশরথের তিন রাণীর, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নসম অমিততেজসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

পরবর্তীকালে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও দেবী শান্তা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে সহাদ্রি পর্বতের নিকট তুঙ্গ নদীর তীরে পার্বত্য বনভূমিতে আশ্রম নির্মাণ করত শিষ্য পরিবৃত হয়ে বহুকাল তপোরত জীবন অতিবাহিত করেন। প্রবাদ আছে, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির দেহত্যাগকালে তাঁর দেহ হতে নির্গত একটি বিদ্যুতের ঝলক তাঁর পূজিত শিবলিঙ্গের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের সমাধির উপর যে শিবলিঙ্গটি স্থাপিত আছে তাতে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের অনুরূপ একটি শৃঙ্গ দেখা যায়। এই শিবলিঙ্গটির দক্ষিণাংশ শান্তাদেবীরূপে বন্দিত। শিবলিঙ্গটি বর্তমানে শৃঙ্গেরী হতে ১০ কি.মি দূরে কিগ্গা নামক গ্রামের এক মন্দিরে অবস্থিত রয়েছে। শিবলিঙ্গটি 'ঋষ্যশৃঙ্গেশ্বর' নামে বিখ্যাত।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ভগবৎলীলা মাত্রই অধ্যাত্ম বিদ্যাসম্পন্ন। রামায়ণের ভগবৎলীলার পর্য্যায়ে অন্তর্যোগের অন্তর্জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও দেবী শান্তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । শান্তাদেবী মহালক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। ইনি দশরথ ও কৌশল্যার কন্যা অর্থাৎ দশরথ হলেন দশচক্র বিশিষ্ট সত্তার পঞ্চভৌতিক দেহরূপ ঘট এবং অন্তঃস্থিত যে কৌশলের

শক্তিদ্বারা এই দশচক্ররূপ দেহরূপ রথে আত্মসত্তাকে ধারণ করা যায়, তিনিই হলেন কৌশল্যা। আত্মারামরূপ আত্মসত্তা দেহরূপ রথে প্রবিষ্ট বা ঘটস্থ হবার পূর্বে আত্মারামকে যে মহাশক্তি বিশুদ্ধ বোধশক্তি প্রদানকরত ঘটস্থ হতে সহায়তা করেন তিনিই হলেন বোধজ্যোতিঃরূপা শান্ত স্থির চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপিণী শান্তা। তাই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের পূর্বে শান্তা দশরথ ও কৌশল্যার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা যোগের দৃষ্টিভঙ্গীতে জ্ঞাত আছি যে পরমাত্মারূপী সগুণব্রহ্ম শ্রীরাম হলেন জীবাত্মার ঘটে আত্মারামস্বরূপ। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ হলেন পরমব্রহ্মের 'একলিঙ্গ' স্বরূপ পরমশিবের প্রতিভূ। তাই তিনি শান্তশ্রী সম্পন্না শান্তা মহাশক্তিকে তাঁর স্ত্রীরূপে প্রাপ্ত হন— এক্ষেত্রে শিব-শক্তি সমরস্য। তাই দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় দুজনেই ঋত্বিকরূপে পবিত্র অগ্নিকে আহ্বান করলে অগ্নিদেব আবির্ভূত হলেন। অর্থাৎ, পরমাত্মাস্বরূপ সত্তাকে ঘটস্থ করবার নিমিত্ত মহৎতত্ত্বরূপ বিশুদ্ধ অগ্নি হতে পরমান্নরূপ অমৃতবীর্য উৎপন্ন হল। সেই অমৃতবীর্য্যের পরমান্ন ভক্ষণ করেই দশরথের পত্নী কৌশল্যা রামরূপ পরমাত্ম সত্তাকে গর্ভে ধারণ করলেন অর্থাৎ মহত্তত্ত্বরূপ অগ্নি হতে অমৃতবীর্য আহৃত হলেই আত্মারামের দশরথ বিশিষ্ট বিশুদ্ধ দেহ সৃষ্টি হল। (*সহায়ক গ্রন্থ— বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত ও যৌগিক তথ্য-শ্রীশ্রীমা)*

সংকলন ঃ— মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া

বেদ ভাবনা

আরও একটি শারদীয়া দুর্গাপূজা বিগত হল। এবার আমাদের অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের ১৮তম দুর্গোৎসব। শারদীয়া নবরাত্র দুর্গাপূজার এই ১০টি দিন বহিরাগত ও আশ্রমস্থ সকল ভক্তবৃন্দের কাছেই অতি আকাঙ্ক্ষিত; কারণ সারা বছরের ক্লান্তি, ক্লেশ, ব্যার্থতাকে মুছে ফেলে তারা নব আনন্দে জেগে ওঠেন। ইং ১৯৯২ সালে আশ্রমে সর্বপ্রথম এই পূজার সূচনা হয়। তখন আমার ১৪ বছর বয়স ছিল। সেই থেকে আমি এই পূজায় অংশগ্রহণ করে আসছি। কিন্তু, আজও ১০ দিন ব্যাপী এই মহাপূজার সুসংবদ্ধ সম্পাদনের রূপরেখাটি আমার মনকে বিস্মিত করে। শ্রীশ্রীমায়ের একচ্ছত্র পরিচালনায় প্রতিটি ভক্ত আজও তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্ম পালন করে চলেছেন। কারও উপর দায়িত্ব পূজার জোগাড় দেওয়া, ঢাক বাজানো, কারও যজ্ঞের সমীধ চয়ন, কারও উপর দায়িত্ব প্রতিদিনের ভাণ্ডারার রন্ধন, কারও বা সারাদিনের যাবতীয় বাসন মাজা, আবার কারও দায়িত্ব পূজার কয়েকটি দিন সমস্ত আশ্রম ও মন্দিরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা । সারাদিনের ব্যস্ততায় হয়তো কারুর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। কিন্তু সবার মনেই যেন সর্বদাই একটি অপার্থিব আনন্দ ও ভাবতন্ময়তার হিল্লোল বয়ে চলেছে অনুভব হয়। করুণাময়ী চিন্ময়ী মায়ের চৈতন্যময় বর্শাঘাতে বিদীর্ণ ভক্ত-হৃদয়ের অন্তরস্থিত মহিষাসুর যেন আজ মূক, অসহায় আত্মসমর্পণে উদ্যত! এই আনন্দ যেন সেই আত্মনিবেদনের প্রেরণারই অভিব্যক্তি! অখণ্ড মহাপীঠের দুর্গোৎসব তাই আজ হয়ে উঠেছে এই চেতনার উন্মেষের বিজয়োৎসব। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বাহ্যিক কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও প্রত্যেকেই অনুভব করেন তাদের অন্তর যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সেই দিব্য আনন্দমগ্নতায় নিবিষ্ট হতে চায়। তাই কোন এক অব্যক্ত অণুপ্রেরণায় যেন পূজার প্রতিটি কর্মই নিপুণভাবে সম্পাদিত হয়।

পূজাসামগ্রী জোগাড়ের কাজে রত ভক্তবৃন্দ

এই পূজার সময় বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর যজ্ঞানুষ্ঠান আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গভীর গম্ভীর শান্ত যজ্ঞগৃহের নৈসর্গীক বাতাবরণ, অন্তঃস্থিত হোমকুণ্ডের লেলিহান বহ্নিশিখা, সেই হোমকুণ্ডকে পরিবৃত করে থাকা ও তৎসহ নিবিষ্ট চিত্ত ভক্তবৃন্দের সমবেত উদাত্ত বৈদিক মন্ত্রচ্চারণের নিনাদ, ঘৃতপ্রলিপ্ত আহুত সমীধের পূত দিব্য সুবাস স্বতঃই চিত্তকে একটি সুউন্নত চেতনার ভূমিতে ভূমানন্দময় আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নীত করে দেয়।

আমাদের শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা, যিনি হলেন একজন নিষ্ঠাবান ক্রিয়াহ্নিক, তিনি এই দুর্গাপূজার প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী শ্রীযজ্ঞনারায়ণ দেবশর্মণ যজ্ঞ প্রারম্ভে কাষ্ঠসজ্জিত হোমকুণ্ডে যজুর্বেদস্থ অগ্নিআহ্বান মন্ত্র ''ওঁ ইহৈবাহ মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন'' ইত্যাদি মন্ত্রচ্চারণ পূর্বক হোমকুণ্ডে অগ্নি সংযোগ করেন। এরপর ক্রমপর্যায়ে নারায়ণ, মহাদেব, মাদুর্গা এবং অন্যান্য দেবদেবীকে উৎসর্গীকৃত